Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.15-22
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে প্রবাদ: (হাঙর নদী গ্রেনেড, মগ্ন চৈতন্যে শিস)

পঙ্কজ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত

Abstract:

Use of proverbs in Selina Hussain's Novel, with special reference to 'Hangar Nadi Graned' (1976) and 'Magna Chaitanye Sish' (1979)

Selina Hussain is a famous novelist of Bengali literature. Even though she belongs to Bangladesh, her literature is the treasure of life for all Bengali readers. On the one hand she is anther of many classic Novels, at the same time she has written several stories and articles which are also exceptionally popular and universally accepted. Selina Hussain mainly wrote novels focusing on Bengali life, culture, tradition, struggle for livelihood etc. Especially various aspects of Bengali folk culture have come up again and again in her novels. Therefore in the present article we will try to highlight the use of proverbs in Selina Hussain's novel.

Keywords: Novel, Culture, Tradition, Folk culture, Proverbs.

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত নারী ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। তিনি শুধু ঔপন্যাসিকই নন সঙ্গে কথা সাহিত্যিক, গবেষক এবং প্রাবন্ধিক। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত নারী ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন মানুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। লেখিকা তাঁর সাহিত্যের আয়নাতে প্রতিবিম্বিত করেন একটি জাতি তথা একটি রাষ্ট্রের জীবনপ্রণালী। প্রতিফলিত হয় সে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি। জীবন মানেই সাহিত্য আবার সাহিত্য মানেই তো জীবন। জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রকাশকে তিনি শুধু কথাসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তারসাথে শক্তিশালী গদ্যের নির্মাণে প্রবন্ধের আকারেও উপস্থাপন করেছেন। সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহী শহরে। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস লক্ষ্মীপুর জেলার হাজীরপাড়া গ্রামে। বাবা হলেন এ.কে.এম মোশাররফ হোসেন আর মা হলেন মরিয়মন্নেসা বকুল।

লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রবাদ। প্রবাদের ইংরেজি শব্দ (Proverb) 'বাদ' ধাতুর সঙ্গে 'প্র' উপসর্গ যোগে প্রবাদ শব্দটি হয়েছে। ধাঁধা, ছড়ার মতো প্রবাদও লোকসাহিত্যের অঙ্গ- যার সৃষ্টি সবার মুখে মুখে। ছড়ারই একটি স্তর হল প্রবাদ। জীবনের নানা অভিজ্ঞতার অন্যতম ফসল হল প্রবাদ। প্রবাদ সৃষ্টির মূল কারণই হল নানা অভিজ্ঞতা। প্রবাদ সম্পর্কে একটি স্পেন দেশীয় উক্তি আছে যে-

> 'A Proverb is a short sentence based on long experience' অর্থাৎ 'প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি।"[১]

আবার অন্যদিকে প্রথম প্রবাদ সংগ্রাহক গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেন—

> "Fragments of an elder wisdom' অর্থাৎ 'প্রাচীন সমাজের বুদ্ধিমত্তার ইহার কতগুলি বিচ্ছিন্ন পরিচয়।"[২]

প্রবাদের মাধ্যমে একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে আবিস্কার করা যায়। তাই পাশ্চাত্য মনীষী Bacon বলেন—

> "The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs' অর্থাৎ 'একটি জাতির বুদ্ধির পরিচয়, কর্মক্ষেত্রে তার স্থৈর্য্য, ও উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রবাদের মাধ্যমে।"[৩]

লোকজীবনের সঠিক পথ নির্দেশক হল প্রবাদ। প্রবাদ এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিস্তারলাভ করে। আমরা চরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই প্রবাদে। আমরা দেখি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মিশরের প্যাপিরাসের গল্পে প্রবাদের ব্যবহার আছে। ভারতীয় বেদ, উপনিষদও প্রবাদ আছে। তাছাড়া চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে প্রবাদের প্রয়োগ পাই। বর্তমান যুগেও সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করি।

প্রবাদ হল লোক মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি থেকে প্রবাদের সৃষ্টি। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিজ নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অনুভূতির তিব্রতা প্রকাশ করা হয় প্রবাদের মাধ্যমে। প্রবাদের মাধ্যমে ফুটে ওঠে প্রাত্যহিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, কৃষ্টি ইত্যাদি বহুবিধ অনুষঙ্গ। সেইসঙ্গে বিভিন্ন রকম বিষয় বস্তুর নানা প্রসঙ্গ। এক কথায় সমাজের সামাজিকতার পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা নানান নির্যাস ফুটে উঠে প্রবাদে। প্রবাদ সমাজের দর্পণ। তাই কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, আখ্যানকার তাদের রচনায় সজীবতা দান করতে এবং লেখাকে গুণগ্রাহী ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য তাদের রচনায় প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমান বাংলাদেশের একজন সমাজ সচেতন লেখিকা হিসেবে সেলিনা হোসেন তাঁর লেখাকে প্রাণবন্ত, প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমস্ত উপন্যাসই কমবেশি প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করেছেন। এই প্রবাদের ব্যবহারের ফলে তার লেখা হয়ে উঠেছে লোক মানুষের কাছে বেশি করে গ্রহণযোগ্য। সেলিনা হোসেনের লেখায় লোকজীবনের অনুষঙ্গ ব্যবহারের ফলে লোকমানুষের কাছে স্বাভাবিক কারণেই তা আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা আমাদের আলোচনায় তাঁর রচিত 'হাঙর নদী গ্রেনেড' ও 'মগ্ন চৈতন্যের শিস' উপন্যাসে প্রবাদের ব্যবহার ও তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন 'হাঙর নদী গ্রেনেড'(১৯৭৬) সালে উপন্যাসটি রচনা করেন। এই উপন্যাসটি হল বাংলা ভাষার উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালের যশোরের কালীগঞ্জ গ্রামের এক মায়ের সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। হলদিগাঁ গ্রামের এক দুরন্ত কিশোরী তার নাম বুড়ি। ছোটবেলা থেকেই চঞ্চলতায় উচ্ছল। কম বয়সেই বিয়ে হয়। তার থেকে স্বামী বয়সে অনেক বড়। স্বামীর নাম গফুর। গফুরের আগের স্ত্রীর দুই ছেলে সলীম ও কলীম। বুড়ির সংসার

জীবন ভালোই লাগে। কিন্তু গফুর বুঝতে পারে না। কিছুদিন পর বুড়ির নিজ গর্ভে সন্তান চায়। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। অবশেষে বুড়ির পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। তার নাম রইস। কিন্তু কথা বলতে পারে না, এমনকি শুনতেও পারে না।

কিছুদিন পর গফুর মারা যায়। সলীমের সাথে রামিজার বিয়ে হয়। তাদের সন্তানও হয়। আর যখন কলীমের বিয়ের জন্য দেখাদেখি হয় তখনই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের রেশ এসে পরে হলদিগাঁয়ে। এই যুদ্ধে বুড়ির সাজানো সংসার ভেঙ্গে যায়। সলীম যুদ্ধে যায়। সলীমের খবর না দেওয়ায় কলীমকে পাকিস্তানি আর্মি বুড়ির সামনে খুন করে। আর তা দেখে বুড়ির মন আরও শক্ত হয়ে যায়। বুড়ি বলে আন্দোলনকে থামানো যাবে না। যেভাবেই হোক এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে যুদ্ধ চলাকালীন হাফেজ ও কাদের শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে বুড়ির ঘরে আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে পাক সেনারা বুড়ির বাড়িতে আসে। মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে তার নিজের সন্তানকে তুলে দেয় পাক সেনাদের হাতে। বুড়ি জানে কলীমের মৃত্যুর জন্য হাজার হাজার যোদ্ধা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। বুড়ি এখন শুধু রইসের মা নন। তিনি এখন সকল যোদ্ধার মা। লেখিকা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে আমরা বেশ কিছু প্রবাদের ব্যবহার দেখি যেমন-

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর"[৪]

এই উক্তিটি করে ছিলেন বুড়ি, আসলে বুড়ি ছোটবেলা থেকেই এই প্রবাদটি শুনেছিলেন। বুড়ির বিয়ে হবার পর তার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল একটি সন্তান গ্রহণ করবে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল বিয়ে করার তবুও তার সন্তান হয় না। এই দুঃচিন্তায় নমিতার সঙ্গে বুড়ি কথা বলেছিল। নমিতার বেশ কয়েকটি সন্তান সে সন্তানদের ঠিক মত খাওয়াতে পারে না। তবুও ভগবান নমিতাকে আরও সন্তান দেয়। তখন বুড়ি বলে এতদিন থেকে ভগবানকে বিশ্বাস করি তবুও আমার কপালে একটা সন্তানও ভগবান দেয় না। ভগবানের প্রতি তার বিশ্বাস উঠে যায় দিন দিন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুড়ি এই উক্তিটি বলেছিল। এই উপন্যাসে আরেকটি প্রবাদ আছে সেটি হল-

"একেই নাচুনে মেয়ে তার ওপর পড়ছে ঢোলের বাড়ি"[৫]

এই কথা বলেছিল বুড়ির ভাই। বুড়ি সবসময় কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে। একটুকুও বসে থাকতে চায় না। সারাক্ষণ কাজ আর কাজ করে। গফুরকে মনে হয় চিনেই না পর পর করে রাখে। সবসময় মনমরা হয়ে থাকে। যখন বাইরে কোথাও গফুরের সঙ্গে ঘুরতে যেত ঠিক পুরো উল্টো হয়ে যায় বুড়ি। গফুরের নৌকায় বুড়ি ওঠে। গফুর বইঠা ছেড়ে বুড়িকে কাছে টেনে নেয়। বুড়ির কিশোরী ঠোঁটে অপূর্ব মাধূর্য। বুড়ি এখন অনেক কাছের, অনেক উষ্ণ, অনেক মিনতি ভরা। বুড়ি কেন সবসময় এমন থাকে না। বুড়ি আজকে কেন কিছু বলে না, সবকিছুই মেনে নিয়েছে এসব দেখে বুড়ির ভাই এই উক্তিটি করেছে।

সেলিনা হোসেনের আরেকটি উপন্যাস 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' (১৯৭৯)। এই উপন্যাসে আমরা চরিত্র হিসাবে অনেককেই পাই মিতুল, জামেরি, রায়হান, রেজা, সরাফি, মিন্টু, ছন্দা, মিতুলের বাবা আলি আহমেদ প্রমুখকে। দেশভাগের পরবর্তী সময়েই এই উপন্যাসটি রচিত হয়। উপন্যাসে রায়হান ছন্দা নামে একজনকে ভালোবাসে। কিন্তু তাদের এই ভালোবাসা বেশিদিন টিকে না। তার কারণ রায়হান খুন করায় ছন্দা তাকে আগের মতো ভালোবাসতে পারেনা তাকে ঘৃণা করে। অন্যদিকে জামেরি মিতুলকে

ভালোবাসতে শুরু করে। একসময় দেখা যায় রায়হান পাগলের মতো হয়ে গেছে। জামেরি তাকে চিকিৎসা করে। রায়হানকে জামেরির বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানেই তার চিকিৎসা করতে থাকে লুকিয়ে রেখে। যেন পুলিশ তাকে খুঁজে না পায়। কিছুদিন পরে রায়হানকে পুলিশ ধরে জেলে নিয়ে যায়। আরেক দিকে জামেরি যাকে ভালোবাসে সে হাসপাতালে ভর্তি, মিতুলের ব্রেন ডেথ হয়েছে। তার 'সিজোফ্রেনিয়া' রোগ হয়েছে। এই উপন্যাসে প্রবাদের ব্যবহার, শুরুতেই মিতুল তার বাবার উদ্দেশ্যে বলে জামেরিকে-

"দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? নাকি ময়ুর পুচ্ছ পরলেই কাক ময়ূর হতে পারে?"[৬]

মিতুল এই উক্তিটি করার কারণ মিতুল ছিল অতি সাধারণ মেয়ে এবং গায়ের রংও ছিল কালো চকচকে আঁধারের ভেলভেটের মতো। দৃষ্টি পিছনে যায়। মিতুল বিদেশি এক সাহায্য সংস্থায় ছোট্ট একটা চাকরি করে। তার মা শৈশবেই আরেক জনের সঙ্গে চলে যায় যখন মিতুলের দুই বছর বয়স। এই কথা মিতুল অনেক পরবর্তীতে জেনেছিল। মিতুলের বাবা আবার অন্য একজনকে বিয়ে করে। মিতুলের নতুন মা-এর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। তবুও আসল মা'য়ের জন্য মিতুলের মন খারাপ থাকে। বাবাকে মিতুল সহ্য করতে পারেনা। সবসময় এড়িয়ে চলে। কারণ বাবা মিতুলকে মা-এর মতো ভালোবাসতে চায়। বাবার মত ভালোবাসে না।

মিতুল মনে মনে ভাবে সে যখন দু'বছর তখনই মা চলে যায়। তাই হয়তো বাবা মা'য়ের অভাব বুঝতে দেয় না। বাবা-মা হয়ে পুষিয়ে দিতে চায়। জামীকে বলে বাবাকে যদি বাবার মতো পেতাম কী ক্ষতি হত। তাহলে আমি হয়তো অনেক কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে পারতাম। কষ্টটা শুধু বুকের ভেতর লাফালাফি করে। এই উপন্যাসে জামী রায়হানকে বলে-

"ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোরও দরকার হয়।"[৭]

এখানে জামী রাতে স্বপ্ন দেখে। কিছু সময় পরে তার স্বপ্ন কোনো কারণ বসত ভেঙে যায়। তখন সে জানালার পাশে এসে সারারাত কাটিয়ে দেয়। তার বাবার কথা খুব মনে পড়ে তখন। বাবার জন্য বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে ছিল। তারপর হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে যায় নিজেও বুঝতে পারে না। জামীর ঘুম ভাঙে দরজার খটখট শব্দে। তখন দরজা খুলেই হাঁড়ি মুখো রায়হান চেঁচিয়ে উঠে বলে, 'উঃ বেলা এগারোটা পর্যন্ত ঘুম? তোকে দিয়ে হবে কীরে চাঁদ?' কথার পরিপ্রেক্ষিতে জামীকে এই উক্তি করে। একথা বলার কারণ অনেক সময় দেখা যায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কোনো জিনিস কখনও নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙে যায়। তখন আমরা ভাবি সেই জিনিসটি কখনই কোনো কাজে লাগবে না। দরকারি কাজের সময় হাতের কাছে কোনো জিনিস পাওয়া যায় না। তখন সেই পুরানো জিনিসটি আমাদের কাজে লাগে। সেই জন্যই 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো দরকার পরে'। ঠিক তেমনি এই উপন্যাসে জামী ছিলেন একজন লেখক। সে উপন্যাস লেখেন। কিন্তু কোনো কারণ বসত তার লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। সে আগের মতো এখন আর লেখতে পারে না। কিন্তু জামী ইচ্ছে করলেই আগের মতো এখন লেখতে পারবে। তাই জামী রায়হানকে বলে 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর দরকার হয়। সে এখনও মরে যায়নি বেঁচে আছে। এত অবহেলা যেন রায়হান না করে।

এই উপন্যাসের জামী মিতুলের পুরানো মা'র কাছে যায়। কারণ মিতুলের আগের মা'কে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। দেখতে ইচ্ছে করে। কোথায় থাকে মিতুলের মা তা মিতুল জানে না। দু'বছর পর থেকে আর

দেখতে পায়নি। তাই জামীকে বলে তার মা'কে খুঁজে বের করতে। এরপর জামীও মিতুলের মাকে খুঁজতে থাকে। জামী একদিন মিতুলের মা'র সন্ধান পায় জামী। তখন জামী মিতুলের মা'র কাছে যায় এবং মিতুলের একাকিত্বের কথা বলে। এই কথাগুলি শুনে ঝাকুনি দেয়, এবং তার সাথে আবার রেগেও যায়। তাকে বলে 'মিতুলের মায়ের অধিকার আমি ত্যাগ করে এসেছি। আমি মিতুলের সাথে দেখা করতে চাই না।' এতকিছু বলার পর জামী হয়তো মনে মনে ভেবেছে মিতুলের মা'কে-

"আমি যেন একটা পাতাঝড়া গাছে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছি।"[৮]

এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় পাতাঝড়া গাছে যদি ঝাঁকুনি দেওয়া যায় তাহলে একটাও পাতা গাছ থেকে পড়বে না। কারণ সব পাতা আগেই পড়ে গেছে। গাছের পাতা না থাকলে গাছ আর বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকলেও দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। একই ব্যাপার 'মগ্ন চৈতন্যের শিস' উপন্যাসে দেখা যায়। মিতুলের মা আগের ঘর-সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছে যখন মিতুল দু'বছরের ছিল। এতদিন আগেকার কথা সবকিছু ভুলে গেছে। আর এসব নিয়ে ভাবতেও চায় না। আর জামী এসে আবার পুরানো স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাতে কোনো লাভ হবেনা জামেরীর বা মিতুলের। কারণ মিতুলের মা কোনো দিনই যাবে না দেখা করতে মিতুলের সাথে। তাই হয়তো জামী ভাবে যে মিতুলের মা ঝড়াপাতা ওয়ালা গাছ, যেখানে সে ঝাঁকুনি দিয়েছে। সেটা এখনও নড়ে। তার মানে মিতুলের মায়ের মনেও এখন পুরানো স্মৃতি অল্প অল্প করে মনে পড়ে।

উপন্যাসে জামেরী চরিত্রটি একজন লেখক। জামেরী একটা উপন্যাস লিখে। কিন্তু কিছু পাতা লেখার পর সে আর লিখতে পারে না। তার মাথায় আর কিছু আসে না। জামী ভাবে কোন কাহিনিকে তুলে ধরবে। আর জামীর সাথে মিতুল তার মা'কে নিয়ে কথা বলে। মিতুল নানা ধরণের চিন্তা-ভাবনা করে। এমন সময় জামী মিতুলকে জোর করে চুমু দিয়ে দেয়। আর মিতুল এক ঝাটকায় জামীর হাত ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। জামী শুয়ে শুয়ে মাথায় উপন্যাসের বিষয় চলে আসে। সেই উপন্যাসের নাম রাখবে 'মগ্ন চৈতন্যের শিস'। জামীকে নাম নিয়ে ভীষণ ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। জামী কিছুতেই উপন্যাসের নাম ঠিক করতে পারে না। জামীর মনে হয় সে অনেকগুলি পৃষ্ঠা লিখতে পারবে। তাই জামী বলে—

"মগজ যেমন জলপিঁপির মতো ডাক ছাড়ছে।"[৯]

এখানে মগজ আমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি আমাদের ভারসাম্য বজায় রাখে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নিয়ন্ত্রন করে। ঠিক সেভাবেই জামেরীর চিন্তা ধারাও যেন জলপিঁপিরের মতই ঘুরপাক খাচ্ছে। তেমনি জামীরের মাথায় যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা এতো দিন আসেনি। তা আজ হঠাৎ করে মাথায় চলে আসে। মিতুলকে চুমু দিয়েছে তাই হয়তো সবকিছু একের পর এক মাথায় চলে আসে।

মিতুল হাসপাতালে ভর্তি। তাকে দেখতে জামী অফিস বন্ধ করে মিতুলের কাছে যায়। মিতুলের সাদা ধবধবে বিছানা, আর হিস্-হিস্ ধ্বণি শুনতে পেয়ে অন্য জগতে চলে যায়। জামীর মনে হয় 'আমি যেন এক সাদা রাজহাঁসের পিঠে চরে বসেছি। হলুদ পায়ে সাঁতার কেটে ও আমাকে নিয়ে যাচ্ছে... নিয়ে যাচ্ছে।' হাসপাতালে গিয়ে মিতুলের সঙ্গে দেখা করার পর নানা ধরণের বিলাপ করেছিল জামেরী ও মিতুল। সংস্কার জীবনের প্রাপ্তিকে ছোটো করে আনে। মিতুল যখন জামীকে ভালোবাসতো তখন জামী মিতুলের মনের কথা বুঝতে পারেনি। মনে মনে জামী ভাবে, হয়তো মিতুল তাকে ভালোবাসে কিন্তু সাহস করে বলতে পারেনি।

অনেক সময় জামী মিতুলকে বলে, 'তুই কেমন আছিস?' তখন মিতুল বলে 'তোমার ভালোবাসায় ভালোই আছি'। মিতুলের এই কথাগুলি শুনে জামী আবেগে বলে যে-

> "আমার ভালোবাসায় যদি ভালোই থাকবি, তবে কেন তোকে ধরে রাখতে পারলাম না। আসলে তোকে পাবার মতো যোগ্যতা আমার ছিল না। তুই বড়ো অসময়ে আমার জীবনে এসেছিলি। অসময়ের ফল বেশি দিন টেকে না।[১০]

এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় কোনো ফল সঠিক ভাবে পরিপুষ্ট হলে সেটাকে যতদিন টিকিয়ে রাখা যাবে, অপরিপুষ্ট বা অসময়ে তুলে আনা ফলকে ততদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। কারণ পচে যাওয়ার সম্ভবনাই বেশি। তেমনি আমাদের জীবনেও সঠিক সময়েই সঠিক কাজটি করা দরকার। কারণ অসময়ে কোনো কাজ করলে সুফলের থেকে কুফল হওয়ার সম্ভবনাই বেশি। তাছাড়া সে কাজের ফল কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হবে না। ক্ষণস্থায়ী বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়।

ঠিক তাই জামীরের জীবনেও মিতুল অসময়ে আসে। এমন সময়ে আসে তখন মিতুল মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। হয়তো সে আর বাঁচবে না। এই প্রবাদের মাধ্যমে লেখিকা তাই বোঝাতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে নাসিমা আর সাব্বির দু'জন দু'জনকে বিয়ে করবে। নাসিমার আগে একবার বিয়ে হয়েছে। স্বামীকে ছেড়ে চলে আসে সে। নতুন সম্পর্ক করে সাব্বিরের সাথে। কিছুদিন পরপর সাব্বির নাসিমার রুমে যেত। নাসিমা সালমাদের বাড়িতে একটা রুম নিয়ে থাকে। সালমার মা-বাবা নাসিমাকে ভালোচোখে দেখে না। কারণ নাসিমা বিয়ে করা সত্যেও সাব্বিরের সাথে সম্পর্ক, তাই কেউ নাসিমাকে ভালো পেত না। একদিন হঠাৎ সালমা নাসিমার মুখে শুনতে পায় যে, তাদের বিয়ে। এই কথা শোনার পর নাসিমার ঘরের চারিদিকে নানা ধরণের ফুল দিয়ে সালমা সাজিয়ে দেয়। এমনকি নাসিমাকেও সাজিয়ে দেয়। সালমা রাতের বেলা পার্টির পর সবাই যখন খাওয়া দাওয়া করে চলে যায়। তখন সালমাও নিচে নেমে এসে দেখে নিচে বসে আছে সালমার মা ও সাকিব। ওরা জানতো না যে আজ নাসিমার বিয়ে। সালমার মুখেই প্রথম শুনার পর সালমার মা বলে-

"যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।"[১১]

এই উক্তি প্রসঙ্গে বলা যায় অনেক সময়েই গৃহ বধূরা বাড়ির সব কাজ করে। সকলের সমস্থ রকম দাবী পূরণ করে। কার কখন কী দরকার তার জোগান দেয়। কিন্তু যদি সে সমাজের তথাকথিত নিয়মের বাইরে বেরতে চায় বা ভেতরে ভেতরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। আর তা যদি প্রতিবেশীরা জানতে পারে তখন সে অনেকের চোখেই 'খারাপ মহিলা' বা ইর্ষার পাত্রি হয়ে যায়। এই রূপে নাসিমাও সালমার মার কাছে 'খারাপ মহিলা' হয়ে যায়। এই কারণেই সালমার মা ঘৃণা ভরা উক্ত প্রবাদটি বলে।

একদিন নাসিমার বাড়িতে গিয়ে ওঠে সালমা। ওখানে গিয়ে দেখে নাসিমা ও সাব্বির তারা দু'জনে বাড়ি ছাড়বে বলে জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। তা দেখে সালমা অবাক হয়ে নাসিমাকে প্রশ্ন করে চলে যাবার কারণ জানতে চায়। সে জানতে পারে তাদের বাচ্ছা হবে বলে বড় বাড়ির দরকার এই জন্য তারা বাড়ি ছেড়ে দিবে। এই জন্যই নাসিমা ও সাব্বির কাজ করছে। কিন্তু নাসিমা গর্ভবতী বলে বারবার বিশ্রাম নিতে হয়। নাসিমাকে এমন করতে দেখে সাব্বির বলে-

"ভাবখানা এই- যেন মাঠে হাল চালাচ্ছে।"[১২]

এইখানে সেলিনা হোসেন নারীদের প্রতি অর্থাৎ গর্ভবতী নাসিমার প্রতি বিরক্তি বোঝাতে পুরুষরা উল্লেখিত প্রবাদ ব্যবহার করে। আমরা জানি মাঠে হাল চাষ করা খুবই পরিশ্রমের কাজ। এতই পরিশ্রমের কাজ যার জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে হয়। ঠিক একই রকম নাসিমা ঘর গোছানোর সময় কিছু সময় পরপর বিশ্রাম করে। তা দেখে সাব্বির বোঝাতে চেয়েছে যে ঘর গোছানো তো হাল চাষ করার মত এত পরিশ্রম না। এই প্রবাদের মধ্যে অনেকটা নারীদের উপর অবহেলা দেখানো হয়েছে। পুরুষ শাষিত সমাজকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবাদের মাধ্যমে।

সেলিনা হোসেন এককথায় কথাসাহিত্যিক। তাঁর উপন্যাসগুলিতে রাজনৈতিক, নারীর শাশ্বত দৃষ্টি, স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যকে দৃঢ় করেন। কোনভাবেই নিজের ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, মুক্তিকামী বাঙালির সংগ্রামকে নিচু চোখে দেখেননি। লেখিকা নিজের চিন্তায় ইতিহাসকে সমকালীন চিন্তার সঙ্গে মিল করেছেন। আর তা থেকেই উপন্যাসগুলি রচনা করেন। তিনি উভয়ের যে আনুপাতিক সম্পর্কে তৈরি করেন, বাংলা উপন্যাসে তা এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। তাঁর উপন্যাস পড়লে বোঝা যাবে না কোনটা ইতিহাস আর কোনটা কল্পনা। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতি নির্ভর শুধু নয়। আমরা দেখতে পারি জীবন ও সমাজ বাস্তবতার সুন্দর যোগসূত্র। সেলিনা হোসেন 'জীবন যেখানে যেমন' এই আদর্শে বিশ্বাস করেন। তাই উপন্যাসে শিল্পমানের চেয়ে জীবনের কঠিন বাস্তবতা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। তাই বাংলা সাহিত্যে সেলিনা হোসেনকে এক উচ্চতা আসনে বসিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

1. ইসলাম জুনেজার, 'লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার', গ্রন্থবিকাশ, ৫৯/১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুন, ২০১৫, পৃ: ৪৬।
2. তদেব, পৃ: ৪৬।
3. সিদ্দিকী ড. আশ্‌রাফ, 'লোক-সাহিত্য' ২য় খন্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ- ২০১৩, পৃ: ২২।
4. হোসেন সেলিনা, 'উপন্যাস সমগ্র' (প্রথম খন্ড), 'হাঙর নদী গ্রেনেড'(১৯৭৬), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা, পৃ: ১২০।
5. তদেব, পৃ: ১২৫।
6. হোসেন সেলিনা, 'উপন্যাস সমগ্র' (প্রথম খন্ড), 'মগ্ন চৈতন্যে শিস'(১৯৭৯), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা, পৃ: ২১১।
7. তদেব, পৃ: ২১৭।
8. তদেব, পৃ: ২৫৩।
9. তদেব, পৃ: ২৫৭।
10. তদেব, পৃ: ৩১৯।
11. তদেব, পৃ: ৪০৫।
12. তদেব, পৃ: ৪১৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. ইসলাম জুনেজার, 'লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার', গ্রন্থবিকাশ, ৫৯/১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১৫।
2. সিদ্দিকী ড. আশ্‌রাফ, 'লোক-সাহিত্য' ২য় খন্ড, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ- ২০১৩।
3. হোসেন সেলিনা, 'উপন্যাস সমগ্র' (প্রথম খন্ড), 'হাঙর নদী গ্রেনেড'(১৯৭৬), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা।
4. হোসেন সেলিনা, 'উপন্যাস সমগ্র' (প্রথম খন্ড), 'মগ্ন চৈতন্যে শিস'(১৯৭৯), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা।
5. ভট্টাচার্য ড. কৃষ্ণা, 'প্রবাদে বাঙালার সমাজ জীবন', প্রকাশক- শরৎচন্দ্র পাল, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১কলেজ রোড, কলকাতা-৯।
6. চক্রবর্তী বরুণকুমার, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, কুমকুম মাহিন্দার, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০৯, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৭৭, পুনর্মুদ্রণ- মার্চ, ২০১৫।